



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 983 - 989

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাঙালিদের পথপ্রদর্শনে ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিদেশীদের কর্মজীবন প্রসঙ্গ : 'ভারত-মহিলা' পত্রিকা

অনন্যা সামন্ত

Email ID: ananyasamanta1812@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Bharat-Mahila,
Sachitra Masik
Patrika,
Sarajubala Dutta,
Foreign
Personalities,
Inspiring Society,
Social Reform,
Women
Empowerment,
National Indian-
Association.

Abstract

The journal 'Bharat-Mahila' was issued under the direction of Sarajubala Dutta from the month of Bhadra in 1312. It was a monthly periodical and run from 1312 to 1324. In that magazine, I wrote about the creations and lives of some famous foreign personalities who gave their entire lives for the society. During their social reform work, they encountered many difficulties and challenges, but even then, they did not give up their mission of social reform.

Miss Manning, as a member of the "National Indian-Association", was instrumental in many ways. She was the one who initiated the setup of schools for Indian girls, and along with this, she pioneered a fair salary system for women teachers in those schools. Besides, she was actively involved in a number of other social initiatives. Though Josephine did not engage in social work directly, her loving nature made the people love and respect her. She was a powerful and nice companion to her husband, Napoleon. Even when he left her, she remained faithful and did not turn her back on him.

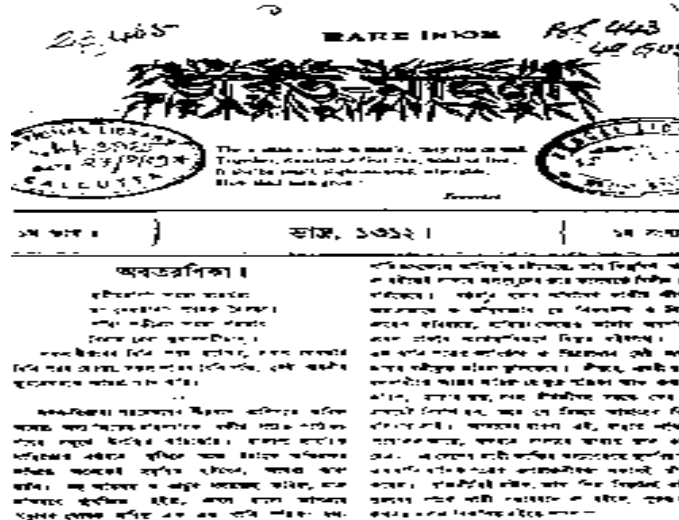
After a successful career as a newspaper editor, William Stead decided to dedicate his whole life to the dignity of women. He was fearless, courageous, and selfless in his social reform work. Despite the great success he attained, he stayed humble and always thought of himself as a simple man.

By presenting the lives and contributions of these inspiring individuals, the editor of 'Bharat-Mahila' wanted to encourage everyone—both women and men—to come forward and take part in social improvement. She believed that meaningful change is possible only when people work together with unity and determination.

Discussion

মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি সচেতনতা তৈরিতে সংবাদ-সাময়িকপত্রের স্থান ছিল অন্যতম। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষাতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি পুরুষেরা ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুকরণে সাময়িকপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সমাজ পুরুষ শাসিত, তাই পুরুষদের পদক্ষেপ ছিল অগ্রবর্তী। কিন্তু সমসাময়িক সমাজ সংস্কারকরা বুঝতে

পেরেছিলেন, শুধু পুরুষদের এগিয়ে গেলেই হবে না। তার সঙ্গে মেয়েদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর যতদিন না মেয়েরা নিজে থেকে সচেতন ভাবে এগিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে, ততদিন তাদের উন্নতি করা সম্ভব নয়। এই চেতনা বোধ একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই তাঁদের মনে সঞ্চার করা সম্ভব। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মেয়েদের কথা ভেবে প্রথম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার *মাসিক পত্রিকা* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকাটি প্রধানত অন্তঃপুরের অল্প শিক্ষিত নারীদের পড়ার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি বিশেষ করে মহিলাদের কথা ভেবে লেখা হয়েছিল চলিত গদ্যে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের পড়ার ইচ্ছে থাকলে পড়তে পারতেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। প্রতি মাসে একটি করে সংখ্যা প্রকাশ হত। তার মূল্য ছিল এক আনা। পত্রিকাটি চার বছর মাত্র চলেছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে আস্তে আস্তে অন্তঃপুরের মেয়েরা শিক্ষিত পুরুষদের সাহায্যে পড়াশোনাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের দুঃখের কথা লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রথম দিকে মহিলারা চিঠিপত্র দিয়ে লেখা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন পত্র-পত্রিকায়। মেয়েদের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কৃষ্ণকামিনী দাসীর ‘চিত্তবিলাসিনী’ (১৮৫৬)। প্রধানত কাব্য এটি। তবে কোনো কোনো অংশে গদ্যও আছে। রচনাটির মধ্যে বিধবাবিবাহ নিয়ে দুই নারীর কথোপকথন আছে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বামাসুন্দরী দেবীর লেখা প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ গ্রন্থ হল ‘কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?’। এরপর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা ‘হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা’, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’, এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্বশোভা’ প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবেই মহিলারা বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ নিজেদের জায়গা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থ রচনা করেই সেকালে নারীরা থেমে ছিলেন না। একই সঙ্গে পুরুষদের মত সাময়িকপত্র সম্পাদনার কাজেও দায়িত্ব নিয়েছিলেন। *বঙ্গমহিলা* পাক্ষিক সংবাদপত্রটি হল মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। এরপরে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা *অনাথিনী*, সম্পাদক ছিলেন থাকমণি দেবী। মহিলা সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক সংবাদপত্র *হিন্দুললনা* (১৮৭৮)। এই বছরেই অর্থাৎ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি মাসিক পত্রিকা *পরিচারিকা* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রথমে প্রকাশিত হলেও, পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় *ধ্বংসীয় মহিলা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বেরিয়েছিল মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *বঙ্গবাসিনী*। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে *সোহাগিনী* নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় *বালক* নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে *বিরহিণী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা সুশীলাবালা দেবী প্রকাশ করেছিলেন।



১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বনলতা দেবী অন্তঃপুর নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মুকুল নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটিই পরবর্তীকালে (১৯০০) হেমলতা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছিল। এরপরে ১৩১২ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, সরযুবালা দত্তের সম্পাদনায় ভারত-মহিলা নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারত-মহিলা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সরযুবালা দত্ত পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন, -

“নীরবে, একটি দুর্বল বঙ্গনারীকে আশ্রয় করিয়া যে ক্ষুদ্র পত্রিকা আজ জন্মগ্রহণ করিল, তাহার সুস্থ, সবল দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে কেহ যদি প্রথমেই নিরাশ হন, তবে সে বিষয়ে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমাদের ধারণা এই, যাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে, ভগবান্ সংসারে তাহার স্থান করিয়া দেন। ... রাজনীতিই হউক, আর শিল্প বিজ্ঞানই হউক পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইবে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না। ... অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ... দ্বা করিয়া দিয়াছেন। ... কে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে ... সর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কৰ্ম্মে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য ‘ভারত-মহিলার’ জন্ম।”^১

এছাড়াও এই পত্রিকার প্রথমেই তিনি বহু ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিদেশী নারী ও পুরুষের কর্মজীবন নিয়ে, অনুপ্রেরণা যোগানোর কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

“এ দেশ ও বিদেশের ... স্ত্রীশীল পুরুষ ও রমণীদের নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক ... স্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত ... রিবে।”^২

তাই তিনি এই পত্রিকাতে বিশিষ্ট স্বদেশী ব্যক্তিদের, যেমন— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, মালবেরী, এবং বিদেশী ব্যক্তিগণ— কুমারী ম্যানিং, ক্যাথেরিন টেইট, কুমারী লুকাস, জোসেফাইন, মহামতি স্টেড এবং আরও অনেকের কর্মজীবন সম্পর্কে প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আমি এই প্রবন্ধে মূলত বিদেশী ব্যক্তিদের নিয়েই আলোচনা করব।

ভারত-মহিলা পত্রিকায় ‘কুমারী ম্যানিং’ সম্পর্কে সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন,-

“তিনি অতীব বিনয়ী ও আত্মগোপনেচ্ছু ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন লোকহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার প্রসিদ্ধি বা প্রশংসা হয়, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। তিনি কার্যের মাহাত্ম্যই দেখিতেন, যাহাদ্বারা কার্য সম্পাদিত হইল তাহার নমোল্লেক্ষ বা যশোকীর্তন সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক বোধ করিতেন। বিশেষতঃ নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না, সকল কার্যই শঙ্কা ও সঙ্কোচ সহকারে করিতেন।”^৩

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কেমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন! এছাড়াও তিনি যৌবন থেকেই কুমারী কার্পেন্টারের সহকারী হয়ে পতিতা রমণীর উদ্ধার ও শিক্ষা, পরিত্যক্ত বালক-বালিকার তত্ত্বাবধান, শ্রমজীবী শ্রেণীর উন্নতি, কারাবাসীদের সংশোধন প্রভৃতি বহু সমাজকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি কিংগারগার্টেন নামে শিক্ষাপ্রণালীর প্রচার উদ্দেশ্যে স্থাপিত ‘ফ্লোবেল সোসাইটি’র সম্পাদিকা ছিলেন। কুমারী কার্পেন্টার ছাড়াও তাঁর বিমাতা দ্বিতীয়া মিসেস ম্যানিং-এর জন্য তিনি ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ করে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৭০ সালে বৃষ্টল নগরে ‘জাতীয় ভারত-সভা’ নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। লণ্ডনেও এর একটি শাখা ছিল। কুমারী কার্পেন্টার ছিলেন উক্ত সভার প্রথম সম্পাদিকা। সেই সময় কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং এই সভার প্রতিষ্ঠা কার্যে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে কুমারী কার্পেন্টার স্বর্গগত হলে, কুমারী ম্যানিং উক্ত সভার সম্পাদিকা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত সভাটির সদস্য হয়ে, অক্লান্ত ভাবে ভারতবাসীর জন্য সেবা করেছিলেন। ‘জাতীয় ভারত-সভা’র মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল— এক, চিন্তাশীল ও জনকল্যাণকারী ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাদেরকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহী করা এবং বক্তৃতা বা সামাজিক সম্মেলনের আয়োজন করে, ইংরেজ ও ইংল্যান্ড প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা।

দুই, 'ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজীন্ য়াণ্ড রিভিউ' নামে একটি মাসিক পত্র প্রচার। তিন, ইংল্যান্ড প্রবাসী ভারতীয় যুবকদের তত্ত্বাবধান ও নানা উপায়ে তাদের উপকার করা। চার, ভারতবর্ষে মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তি ও পুরস্কার দান ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে ভারতীয় রমণীদের উন্নতি সাধন। কুমারী ম্যানিং এই সমস্ত কাজেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর সেবা পরায়ণ মানসিকতা এবং অহং মুক্ত ব্যবহারের ফলে অনেক ভারতবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি উচ্চ জাতির হওয়া সত্ত্বেও কখনো ভারতীয়দের ছোট করেননি। বরং ভারতীয়দের জন্য তাঁর মন ছিল উদার ও দয়ালু প্রকৃতির। তিনি এই দেশে দু'বার এসেছিলেন। প্রথমে ১৮৮৮ সালে ও দ্বিতীয় বারে ১৮৯৯ সালে। তাঁর ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজীন্ য়াণ্ড রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ভারতে এসে যে সকল স্থান পরিদর্শন করেছিলেন— মুম্বাই, পুনা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর কলকাতা, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, আমেদাবাদ, জয়পুর, বরদা, সুরাট ও কাটিবার ইত্যাদি। তিনি মোট পঞ্চাশটি মহিলা বিদ্যালয়, অনেক কলেজ, হাসপাতাল এবং দাতব্যশালা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি এদেশের 'জাতীয় ভারত-সভা'র নয়টি শাখা দেখে গিয়েছিলেন। তাঁকে ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৪ সালে 'কৈসরী-ই-হিন্দ' পদে ভূষিত করেছিলেন। প্রবন্ধের শেষে ভারতীয় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, -

“আমার অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা এই যে শিক্ষিতা ভারতবধূরা তাঁহাদের হৃদয়ও হস্তকে কেবল নিজ নিজ পরিবারের সেবায় আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের সেবায় প্রসারিত করেন, আর শিক্ষিতা ভারত-কুমারীগণের মধ্যে অনেকে দাম্পত্য সুখের জন্য আত্যন্তিক পিপাসু না হইয়া কুমারী ম্যানিংয়ের সদৃশা দেবকন্যার পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।”^৪

অর্থাৎ সেকালের শিক্ষিত ভারতীয় মহিলাদের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই প্রাবন্ধিক মূলত এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

অমৃতলাল গুপ্ত 'জোসেফাইন'-এর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, -

“... জোসেফাইনের করুণ-কাহিনী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উহা পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে গগুদয় সিক্ত হয়, এবং মনে হয়, যেন একখানি সুমিষ্ট বিয়োগান্ত কাব্য পাঠ করিতেছি।”^৫

জোসেফাইন ছিলেন নেপোলিয়নের পত্নী। নেপোলিয়ন তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। জোসেফাইন যদি ভারত-মহিলা হতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। উপরন্তু সেই বিধবার যদি সন্তান থাকে, সেটি হত আরও জঘন্য অপরাধ। কিন্তু জোসেফাইনের কথা স্বতন্ত্র। কারণ তিনি ছিলেন ইউরোপীয় মহিলা। ইউরোপের সমাজে আদর্শ ভিন্ন প্রকার। প্রাবন্ধিকের মতে, -

“সাময়িক ও সামাজিক আদর্শ দ্বারাই সামাজিক নীতির বিচার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াও শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামী গ্রহণ করিয়াও সতীত্ব-গৌরব অখুল রাখিয়াছেন। বর্তমান সমাজে তাহা করিলে, তাহাকে নিকৃষ্ট কার্য্য ভিন্ন আমরা আর কি বলিতে পারি?”^৬

অর্থাৎ সময় ও সমাজ অনুপাতে আদর্শ হয় ভিন্ন রকম। নেপোলিয়নের সঙ্গে জোসেফাইনের বিবাহের সময় তাঁদের বয়স ছিল, ছাব্বিশ এবং আটাশ বছর। জোসেফাইন বীরাজনা পত্নী না হলেও, নেপোলিয়নের জীবনে সুখ ও ভালোবাসার জন্য যে রূপ পত্নীর আবশ্যিক ছিল, তিনি ছিলেন ঠিক তেমনি। জোসেফাইনের মধ্যে যে তিনটি গুণ লক্ষ্য করা যেত — প্রথম, তাঁর নিরুপম প্রীতি ও অপূর্ব হৃদয় মাধুরীর দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন ও মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা। দ্বিতীয়, তাঁর করুণা ও সহৃদয় স্বভাব। তৃতীয়, নিষ্কাম পতিব্রতা। একটি মনোরম বৃক্ষ যেমন পত্র, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে, তেমনি জোসেফাইনের জীবন এই তিনটি বিশেষ গুণে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করে, তাঁর প্রেম ও সেবাকে নিজের কাজে লাগানোর পরে, তিনি বুঝতে পারেন, ফরাসি সিংহাসনকে রক্ষা তাঁর পত্নী সঙ্গে থাকলে সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাকে বর্জন করেছিলেন। তবুও জোসেফাইন নেপোলিয়নের এই কাজের জন্য কোনো দোষারোপ করেননি। বরং তিনি পুরাণ বর্ণিত হিন্দু রমণীর ন্যায় নেপোলিয়নকে জীবনের দেবতা বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। এই সময় নেপোলিয়নও জোসেফাইনের মত পত্নীর প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে মর্মান্তিক কষ্টে দগ্ধ হতে শুরু

করেছিলেন। তবুও তিনি অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যাকে সম্রাজ্ঞীরূপে পেয়ে, তাঁকে হেসে, প্রেমলাপ করে, চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে মন জয় করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠেছিল। যে সিংহাসনের জন্য তিনি একদিন জোসেফাইনকে ত্যাগ করেছিলেন, তার থেকে বঞ্চিত করে এলবাদ্বীপে তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। যদিও জোসেফাইন সেসময় সকল সুখ ত্যাগ করে এলবাদ্বীপে গিয়ে নির্বাসিত নেপোলিয়ানকে সেবা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সম্মতি দেওয়া হয়নি। নেপোলিয়ন পরবর্তী কালে জোসেফাইনের এই মহত্বের উল্লেখ করে বলেছিলেন, -

“যদিও আমি আমার সম্পদের সময় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমার দুরবস্থার সময় আমার সহিত একত্র বাস করিয়া নির্বাসন দুঃখভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তিনি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে আমার ও তৎপ্রতি আমার ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।”^৭



কিন্তু জোসেফাইনের আর এলবাদ্বীপে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপরে ভক্ত যেমন ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করে, জোসেফাইন তেমনি ‘এলবাদ্বীপ-নেপোলিয়ান’ বলে এই সংসার থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে বন্দি নেপোলিয়ন সেন্টহেলেনা দ্বীপে ইংরেজের বর্বরোচিত ব্যবহারে নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে ‘ফ্রান্স’ এবং ‘জোসেফাইন’ বলতে বলতে দেহ ত্যাগ করেছিলেন। নেপোলিয়ান ভালো সময়ে তাঁর পত্নীকে ত্যাগ করলেও, তিনি খারাপ সময়ে তাঁর স্বামীর হাত ছাড়েননি। বরং সে তাঁর পত্নী ধর্মের থেকেও বেশি, একজন প্রকৃত মানবিকতা সম্পন্ন মানুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। যার জন্য জোসেফাইন শুধু সম্মানের নয়, বরং সকলের মন জয় করে ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। জোসেফাইনের জীবনী আমাদের শিক্ষা দেয়, ভালো সময়ে কাছের মানুষ সঙ্গে না রাখলেও, খারাপ সময়ে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে অবশ্যই দাঁড়ান উচিত।

প্রাবন্ধিক ‘মহামতি স্টেড’ সম্বন্ধে বলেছিলেন, -

“স্টেডের চরিত্রে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা একাধারে বিরাজ করিত। পৃথিবীর যেখানে অধর্ম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার সেইখানেই ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্টেড অগ্রসর হইতেন।”^৮

উইলিয়াম স্টেড ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্টেডের পিতা একজন অতি দরিদ্র, উদারপ্রাণ ধর্মযাজক ছিলেন। পুত্রও হয়েছিল পিতার মত। তাঁদের অবস্থা ছিল অসচ্ছল। যার জন্য তাঁকে গ্রামের বিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল। তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিদ্যালয় ছেড়ে, সওদাগরের অফিসে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও বিদ্যালয় ছাড়তে হলেও তিনি পড়াশোনা কখনো বন্ধ করেননি। অবসর পেলেই তিনি কঠোর অধ্যয়নে ডুবে থাকতেন। সেই সময় স্টেডের লিখিত কয়েকটি পত্র বিদেশের কোনো এক সংবাদপত্র সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি স্টেডকে তাঁর পত্রিকার লেখক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন স্টেডের বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একুশ বছর। এরপর তিনি ‘পেল্-মেল্ গেজেট’ পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এই পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে ষ্টেড্ যা সত্য ও নীতি সঙ্গত বুঝতেন, নির্ভীক প্রাণে তাই প্রচার করতেন। তখন তিনি লোকপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন। তবুও জনপ্রিয়তার প্রতি তাঁর কোনো ক্ষুণ্ণ ছিল না। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ‘রিভিউ অব্ রিভিউজ’ পত্রিকা প্রকাশিত করে, মাসিক পত্র জগতে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত— সমগ্র বিশ্বের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রের কথা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক তথ্য, পৃথিবীর যাবতীয় বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন বৃত্তান্ত, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি। তাঁর সংবাদপত্র পরিচালনার প্রণালী ইউরোপে ‘New Journalism’ বলে পরিচিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর গ্রাহক ছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে এই পত্রিকার আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণ বার হয়েছিল। এর কিছু বছর পরে মহাপ্রাণ ষ্টেড্ সমাজ-সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন এবং লণ্ডনের অসংখ্য অসহায়, অল্পবয়স্ক, পতিতা ইংরেজ কুমারীদের রক্ষা করার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। তিনি তখন লণ্ডনের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওই সমস্ত মেয়েদের কথা পত্রিকায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলে বহু লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পত্রিকাটি পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য ষ্টেড্ একটুও ভয় বা নিরাশ হননি। বরং আরও বেশি অদম্য উৎসাহে বিপন্ন ও অসহায় নারীদের উদ্ধার করতে, নিজের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই রূপে তিনি ইংল্যান্ডে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বুয়র যুদ্ধের প্রধান নায়ক বিখ্যাত সিসিল রোডস্ ষ্টেডের অলৌকিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে এক উইলে দেড় কোটি টাকা মূল্যের এক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। ভারতের আরম্ভহীন সমাজ ব্যবস্থা ও গভীর আধ্যাত্মিকতা ষ্টেডের উচ্চপ্রাণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই দেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর গৃহে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। ষ্টেডের হঠাৎ মৃত্যুতে ভারতবাসী এক বিশেষ মিত্রকে হারানোর মত শোক পেয়েছিল। হেগ নগরের ‘শান্তি সভা’ ছিল ষ্টেডের এক অক্ষয় কীর্তি। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ‘ধর্ম ও জনসংগঠন’ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য টিটানিক জাহাজে ষ্টেড ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু মাঝপথে টিটানিকের ডুবে যাওয়ার ফলে তাঁর দেহাবসান হয়েছিল। ষ্টেডের জীবনীশক্তি আমাদের শিক্ষা দেয়, জীবনে ভালো কাজ করতে গেলে বাধা-বিপত্তি আসবে। তবুও নিজের লক্ষ্যে অটল থেকে, নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই কার্য সিদ্ধি হওয়া সম্ভব।

ভারত-মহিলা পত্রিকায় এই সমস্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিদেশীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলার মানুষদের এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। বিদেশীরা যদি জীবনে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে পারে, বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, বাংলার মানুষও পারবে। তবে শুধুমাত্র নারী বা পুরুষদের দ্বারা পরিবর্তন হবে না। সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষ একা এগিয়ে গেলেও উন্নত সমাজ গড়ে উঠবে না। কারণ নারী যতদিন পিছিয়ে থাকবে, ততদিন সমাজের সম্পূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই পুরুষের সঙ্গে নারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। যেমন, কুমারী ম্যানিং নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পতিতা মহিলাদের উদ্ধার, কারাবাসীদের সংশোধন, জনকল্যাণকারী ইংরেজদের মনে ভারতবর্ষকে নিয়ে আগ্রহ গড়ে তোলা, ‘ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন্ য্যাণ্ড রিভিউ’ নামে মাসিক পত্রিকার প্রচার, ভারতে মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি নানা কাজে নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়াও ভারতীয়দের প্রতি তার অহংকারহীন ব্যবহার ছিল প্রশংসনীয়। আবার জোসেফাইন একদিকে ছিলেন বয়সে বড়ো এবং বিধবা রমণী। উপরন্তু তাঁর একটি সন্তানও ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নেপোলিয়নকে বিবাহ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর পাশে থেকেছিলেন। যদিও নেপোলিয়ন তাঁকে ভাল সময়ে ত্যাগ করেছিলেন। তবুও তিনি নেপোলিয়নকে কখনো ত্যাগ করেননি। তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে একজন প্রকৃত স্ত্রীর কীর্তব্য হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। উইলিয়াম ষ্টেডের চরিত্রও ছিল অদ্বিতীয়। একজন সমাজ-সংস্কারের যা যা গুণাবলী থাকা প্রয়োজনীয়, তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু ছিল বর্তমান। তিনি ছিলেন— নির্ভীক, নির্লোভ, দৃঢ়চেতা, ন্যায্য ও নীতিবোধ সম্পন্ন, আত্মপ্রচার বিমুখ একজন প্রকৃত পুরুষমানুষ। যিনি নিজের জীবনকে সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। এই সমস্ত চরিত্রের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে জানানোর মাধ্যমে সরযুবালা দত্ত চেয়েছিলেন— বাংলার নারী-পুরুষদের কেমন হতে

হবে, কী কাজ করলে সমাজের উন্নতি হবে, তার জন্য কেমন মানসিকতা আনতে হবে, তার এক প্রতিকৃতি তুলে ধরতে। বাংলার মানুষদের আগে জানতে হবে, অন্যান্য মহান মানুষদের সম্বন্ধে, তবেই তো উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। আগে ভাবতে হবে— তাঁরা পেরেছে, আমরাও পারব। কারণ আত্মবিশ্বাস হল যেকোন কাজের সফলতার প্রথম সিঁড়ি।

Reference:

১. দত্ত, সরযূবালা, ‘অবতরণিকা’, *ভারত-মহিলা*, ভাদ্র, ১৩১২, পৃ. ১-২
২. তদেব, পৃ. ২
৩. তদেব, ‘কুমারী ম্যানিং’, অগ্রহায়ণ, ১৩১২, পৃ. ৭৩
৪. তদেব, পৃ. ৭৫
৫. তদেব, ‘জোসেফাইন’, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, পৃ. ১১২
৬. তদেব, পৃ. ১১৫
৭. তদেব, পৃ. ১১৯
৮. তদেব, ‘মহামতি স্টেড’, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃ. ৬০